সত্যের সন্ধানে নিরন্তর THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর

Publish-Date: 2024-12-24 Edition: দ্বিতীয় সংস্করণ

মোহাম্মদ আবদুল মাননান

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা : ফিরে দেখা

বছর দশেক আগে একটি দৈনিকের জন্য দুখানা নিবন্ধ লিখেছিলাম, দুটোই রাজধানীর চিত্র নিয়ে; একটি 'সরকারি খাতে রাজধানীর শিক্ষাব্যবস্থা', অপরটি 'রাজধানীতে চিকিৎসা সংকট' নিয়ে। সেই সময়ে পরপর তিন বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে সরকারি আর বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক বিবরণ দেখিয়েছিলাম। সরকারি সেক্টরের জন্য সেটি মোটেই সুখপ্রদ ছিল না—দশ বছর পরও সেই দশার পরিবর্তন ঘটেনি। তবে সেই বিবরণ ছিল কেবল রাজধানীর। এ লেখা কেবল রাজধানীর শিক্ষা নিয়ে নয়, বলাই বাহুল্য।

এ সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল নিয়ে নানা কথাই আছে। মধ্যখানে করোনায় প্রায় দুটি বছর পড়ুয়াদের জীবন থেকে হাওয়াই হয়ে গেল; যে ধকল এখনো শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি যায়নি। বিশাল ক্ষতি হয়ে গেছে সব স্তরের পড়ুয়াদের। করোনার আগের কথাতেই ফিরে যাই। দীর্ঘদিন বাম আন্দোলন করা নাহিদ সাহেবের সময়ে পরীক্ষার হলে নকল ফিরে এসেছে, সেটা কেউ বলছে না। সেটার দরকারও ছিল না। কেন ছিল না; সেটা নিয়ে কথা হবেই। পাইকারি হারে এ প্লাস আর গোল্ডেন পাওয়ার জন্য নুরুল ইসলাম নাহিদ হয়তো অমর হয়েও থাকবেন। সে সময়ে ফেল করার সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে অবিশ্বাস্য হারে—হয়তো এভাবেই নকলপ্রবণতা কমে গেছে। কিন্তু এসএসসি-এইচএসসিতে এ ধরনের তেল-ঘিয়ের দাম সমান করায় যা ঘটার তা ঘটে গেছে। ভালো আর মন্দে বিশেষ পার্থক্য থাকল না জীবনের দুটো বোর্ড পরীক্ষায়। পরীক্ষক যথাযথ মূল্যায়ন করার পরও ডেকে ডেকে নম্বর বাড়িয়ে এ প্লাস আর গোল্ডেনের পাহাড় রচনা করা হয়েছে : অনেক ক্ষেত্রেই খাতা মূল্যায়নের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়নি—দ্রুত ফলাফল দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার নেশায়। এতে আর যাই-ই হোক বিদ্যালয়-কলেজে পড়তে হয়নি, পড়াতে হয়নি। নির্বিবাদে আর তলে তলে ধস নেমেছে গোটা শিক্ষাঙ্গনে। পিছিয়ে নেই ডিগ্রি কলেজগুলো। পদার্থ বিদ্যার সম্মান শ্রেণিতে গড় হাজির নব্বই ভাগ, অনুপস্থিত ব্যাবহারিক পরীক্ষাতেও—কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাকে প্রথম শ্রেণি দিয়ে বসে আছে আর এ উদাহরণ এক-দুটো নয়। সেই নামি কলেজের শিক্ষকদের প্রশ্ন—বিস্ময়, ফলাফল কি বিক্রি হয়! দুদিন আগে জেনেছি, একজন শিক্ষক সমাজকল্যাণ অনার্সের আট হাজার খাতা মূল্যায়নের জন্য পেয়েছে, সময় তিন মাস—পেজ গুনে নম্বর দেওয়া ছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কিছুই বাকি রাখেনি। এসব করেও চার বছরের অনার্স চার বছরে শেষ করতে পারছে না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়—যদিও এ কাজের জন্যই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জন্ম; মনে হয়, জন্মের কারণই ভুলে গেছে তারা।

ফলে নিয়োগ পরীক্ষার ভাইভা বোর্ডে ছেলেমেয়েদের অবনমনটা খুব চোখে পড়ে। অনেক সাবজেক্টে চার বছর অধ্যয়ন করেও বিষয়টির মৌলিক বিষয়েও ধারণা পাওয়া যায় না এদের থেকে; প্রশ্নকারীই বরং বিব্রত হয়ে পড়েন। এখন আবার অনার্স পাশ করতে মূল বইয়েরই দরকার হয় না। সমাজবিজ্ঞানে পাশ করেও সমাজবিজ্ঞান কী, জানে না। কেননা ঠিক আগের বছরে ওই সংক্রান্ত প্রশ্ন এসে গেছে বলে পাশ করার জন্য ওটি পড়তেই হয় না; এ নিয়ে আরও আলোচনা হতে পারে। মাঝপথে সেভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া জেএসসি-পিইসি নিয়ে দৌড়ঝাঁপ কম হলো না। অথচ অনার্স খোলা হয়েছে—শিক্ষক নেই, নেই ক্লাস রুম। অনার্স কোর্স খোলা হয়েছে যত্রতত্র; যেমন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে অনেক ক্ষেত্রেই নিয়মনীতি মানা হয়নি—এ যেমন, একটি থেকে অন্যটির দূরত্ব, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসংখ্যা। প্রয়োজনের চেয়ে রাজনৈতিক বিবেচনা আর তদবিরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েই চলছে। এরশাদীয় জমানায় বেশকটি উপজেলায় স্কুল সরকারি করা হয়েছে ঝটিতি (বলা হয়, জনসভায় মানুষ বেশি হলেই সরকারিকরণের ঘোষণা মিলে যেত)। দীর্ঘ এতগুলো বছর পরও সেসব স্কুলে সরকারি প্রাপ্যতা মতে শিক্ষক দেওয়া হয়নি। বরং কেউ চাকরি শেষ করলে সেই পদটিও দীর্ঘদিন খালি আছে। আবার এ সময়ে বেশকিছু কলেজ ও স্কুল সরকারি করা হয়েছে, এখানেও শিক্ষক দেওয়া হয়নি।

নিয়োগ পরীক্ষার ভাইভা বোর্ডে ছেলেমেয়েদের অবনমনটা খুব চোখে পড়ে। অনেক সাবজেক্টে চার বছর অধ্যয়ন করেও বিষয়টির মৌলিক বিষয়েও ধারণা পাওয়া যায় না এদের থেকে; প্রশ্নকারীই বরং বিব্রত হয়ে পড়েন। এখন আবার অনার্স পাশ করতে মূল বইয়েরই দরকার হয় না। সমাজবিজ্ঞানে পাশ করেও সমাজবিজ্ঞান কী, জানে না। কেননা, ঠিক আগের বছরে ওই সংক্রান্ত প্রশ্ন এসে গেছে বলে পাশ করার জন্য ওটি পড়তেই হয় না; এ নিয়ে আরও আলোচনা হতে পারে। মাঝপথে সেভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া জেএসসি-পিইসি নিয়ে দৌড়ঝাঁপ কম হলো না। অথচ অনার্স খোলা হয়েছে—শিক্ষক নেই, নেই ক্লাস রুম।

আত্তীকৃত পূর্বতনরা চাকরি শেষে কী কী সুবিধা পাবে, কবে পাবে, কেউ জবাব দিচ্ছে না; যদি বা আত্তীকৃতদের অনেকেই বাড়ি ফিরে গেছে। এখানে বলতেই হবে, এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীরা অবসরজনিত সুবিধাটুকু পেতে বছরের পর বছর অপেক্ষা করে বসে আছে। এ তো আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের হাল। আরও আছে।

আমাদের সময়ে ব্যাঙ নিজ হাতেই কাটতে হতো; ব্যাবহারিকে একটু ভালো নম্বর পেতে হলে পায়ের দুই হাড়, অ্যাসট্রোগ্লাস-ক্যালকেনিয়ামের পার্থক্য জানতে হতো। জবাফুল কিংবা টাকি মাছের নানা কিছু নিয়ে ভাইভায় প্রশ্ন হতো। অক্সিজেন বানাতে হতো। উচ্চমাধ্যমিকে লবণ শনাক্ত করতে না পারলে ঢাহা ফেল। সেদিনই দুজন পড়ুয়ার সঙ্গে কথা বললাম। দুজনই ভালো কলেজ থেকে বেরিয়েছে। জানাল, এসবের কিছুই করতে হয়নি। ব্যাঙ কিংবা তেলাপোকা ধরতেই হয়নি। কেঁচো দেখেনি। কোনো একটি গ্যাস বা লবণ বানাতে শিখেনি, লবণ সেপারেশন তো দূর-অস্ত। তা ক্লাস কি হয়েছে? আরে এতটা সময় কোথায়? ছাত্র-শিক্ষক উভয়ই টিউশনির পেছনে ছুটছে। ছুটছে তো ছুটছেই; অভিভাবকও কেবল দৌড়াচ্ছে। তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রজেক্টে কাজ করি। কদিন আগেই ছেলেকে ধরলাম, সেকেন্ড ইয়ারের কী অবস্থা? ভয়াবহ জবাব। কলেজের নাম ঢাকা কলেজ। উচ্চমাধ্যমিকের দ্বিতীয় বর্ষে বাংলায় তেরোটি, ইংরেজিতে এগারোটি, পদার্থবিদ্যায় বারোটি, রসায়নে নয়টি, গণিতে সতেরোটি আর প্রাণিবিদ্যায় চৌদ্দটি ক্লাস দিয়ে সেকেন্ড ইয়ার শেষ। পাশাপাশি নটের ডেমে এই সংখ্যা তিনগুণেরও বেশি, সে খবরও নিয়েছিলাম। ঠিক পরের সপ্তাহেই প্রজেক্ট মূল্যায়ন সভা। সভার পর সচিব মহোদয় বললেন, দেখা করে যেও। শিক্ষা প্রকৌশলের প্রধানও বসে আছেন; বললেন, মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কাজ আছে। সভাকক্ষে এ চারজনই—সচিব-মন্ত্রীর দীর্ঘ আলাপ, বাকি দুজন একটু দূরে বসে নীরব শ্রোতা। যদি জানতে চান, বলি, মন্ত্রীর নাম নুরুল ইসলাম নাহিদ, সচিবের নাম সৈয়দ আতাউর রহমান (প্রয়াত)। কোনো একটি প্রসঙ্গে এ 'দশ-বারো-ষোলো লেকচারেই সেকেন্ড ইয়ার শেষ' কথাটা বলার সুযোগ হলো। মাননীয় মন্ত্রী বেশ অবাকই হলেন। বললেন, সেক্রেটারি সাহেব, তিতুমীর, বদরুন্নেছা, বাঙলা কলেজে একটু খোঁজ নিন, দেখুন, ওদের অবস্থা কী। সেই খোঁজ নেওয়া হয়েছে কিনা জানিনে এবং অবস্থার কোনো উন্নতি হয়েছে কি না, সেটা কেউ জানলে জানাতে পারেন—আমার ধারণা অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে গিয়ে দেখা গেল, কেউই কিছু পারছে না। প্রধান শিক্ষক সঙ্গে। বললেন, প্রাইমারি থেকে খুব দুর্বল হয়ে এসেছে। সপ্তম শ্রেণিতে একই অবস্থা। প্রধান শিক্ষকের একই জবাব। অষ্টম শ্রেণিতে অনুরূপ অবস্থা দেখে আমিই বললাম, আড়াই বছর তো আপনারা পড়িয়েছেন, এবার এমন কেন? জবাব! পাওয়া যায়নি—এ দশা তিন-চারটি জেলার একাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের। প্রয়াত শহীদুল আলমকে নিয়ে নানা কথা হতে পারে। কিন্তু তার সময়ে শিক্ষা ক্যাডারের পদোন্নতি জট কেটেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় আর উচ্চবিদ্যালয়ের/যুযুধান স্পষ্ট করতে তিনি শুরু করেছিলেন দুটি পরীক্ষা। ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির তিন মাস পর একবার এবং অষ্টম শ্রেণিতে বার্ষিক পরীক্ষার দুই মাস আগে অপরটা। উদ্দেশ্য ছিল, প্রাথমিকে কী শিখে এসেছে, আর প্রায় তিন বছরে হাইস্কুল কী শিখিয়েছে। আহা, সচিবের বদলির পর এ পরীক্ষাটা সুন্দরবনের বাঘে খেয়ে ফেলেছে যেন। কটি স্কুলের কমিটিতে ছিলাম বলেই ষষ্ঠ শ্রেণিতে দুমাস থ্রি-ফোর-ফাইভের গণিত ও ইংরেজি পড়ানোর রেওয়াজ শুরু করিয়েছিলাম বছরের গোড়াতে। আরও করেছিলাম, যিনি ভালো পড়ান তাকেই নিচের ক্লাসে গণিত ও ইংরেজি পড়াতে হবে। কে বলবে, সেসব আর আছে কি না। হয়তো উটকো ঝামেলা মনে করে বন্ধ করে দিয়েছে, সেই চলে আসার পরের দিনই।

ফলাফলের কথা বলেছিলাম শুরুতে। এসএসসির ফলাফল বেরোনোর পর সবকটি বোর্ডেই জেলা পর্যায়ের আর রাজধানীর সরকারি স্কুলের নাম কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়, পাওয়া যায়, উপরের দিকেই। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়, ক্যাডেট কলেজ, খ্রিষ্টান মালিকানাধীন আর সেনাবাহিনী পরিচালিত স্কুলের সঙ্গে। কিন্তু সরকারি স্কুলের তালিকা নিখোঁজ হয়ে যায় না। এ অবস্থা নাহিদ জমানার আগেও লক্ষ করেছি। এখানে কথাটা বলি, একজন মুরুব্বি বলতেন, লেখাপড়া আর চিকিৎসা দুই জায়গায় আছে। কী রকম? বললেন, খ্রিষ্টান মালিকানাধীন স্কুল-কলেজ আর হাসপাতাল এবং কোনো বাহিনী পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর হাসপাতালে যাও, দেখে এসো। সরকারি সেক্টরের শিক্ষা প্রশাসকরা কী ভিন্ন কিছু দেখাতে পারবেন? এইচএসসির রেজাল্ট বের হলে নামি নামি সরকারি কলেজে নিয়ে একধরনের লজ্জাতেই পড়তে হয়। হাফ-ডজন বছরেও এইচএসসির রেজাল্টে সরকারি কলেজের নাম ওপরের দিকে খুঁজে পাইনি; ঢাকা বোর্ডের জন্য এটি বেশি সত্য। এখন অবস্থার উন্নতি হবে কি, কবে?

মোহাম্মদ আবদুল মাননান : *অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব ও কথাসাহিত্যিক*

Developed by **The Daily Jugantor** © 2024